ওদুদ এবং শাশ্বত বঙ্গ : একটি অনুসন্ধানের পাঠ

রোহন ইসলাম

কাজী আব্দুল ওদুদ : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
সংকলন ও সম্পাদনা : বরেন্দু মণ্ডল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৫
প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা
কথাপ্রকাশ ৮৭ আজিজ মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
৩০০ টাকা

কলকাতার বাসায় আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। পাকিস্তান প্রসঙ্গ উঠতেই চোয়াল শক্ত হল লেখক, সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের। বললেন, 'পাকিস্তান না গোরস্থান! জিন্না না জ্বিন!' সমর্থন আসল স্বয়ং বাড়ির কর্তা কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪–১৯৭০) কাছ থেকে। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতায় একইভাবে গর্জে উঠেছিল যাঁর কলম। এমনকী, দেশভাগের পরেও ওদুদ অটল রইলেন নিজের অবস্থানে। পাকিস্তান সরকারের দেওয়া লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। স্বজনদের থেকে বহু দূরে আমৃত্যু রয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গেই। উপরের আড্ডার সাক্ষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথায় :

> ... সেই যে তিনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন সেটা ছিল তাঁর কাছে সত্যিকারের সীরিয়াস ব্যাপার। নবপ্রবর্তিত দুই নেশন থিওরি তাঁর বিবেক-বিরুদ্ধ। তাছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যেও তাঁকে সেকুলার স্টেটে থাকতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র তাঁকে স্বাধীনভাবে লিখতেই দিত না। এমন কি মহম্মদ সম্বন্ধেও না। কোরানের অনুবাদও কি তিনি স্বাধীনভাবে করতে পারতেন? না। তাঁর জীবনের কাজ অসমাপ্ত রয়ে যেত পাকিস্তানে গেলে।

বিশ শতকের এক জটিল সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদ যাপনে ছিলেন যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের পূজারী। সমকালে তাঁর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও মীমাংসার সন্ধানের চিন্তাচেতনা আজও প্রাসঙ্গিক। অথচ আক্ষেপের

বিষয় হল, 'শাশ্বত বঙ্গ'-এর সন্ধানে থাকা এই জীবনশিল্পীকে পশ্চিমবঙ্গ মনে রাখেনি। অ্যাকাডেমিক দুনিয়ায় ওদুদকে প্রাপ্য মর্যাদার আসনে বসানো দূরের কথা, এই বাংলায় তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি দীর্ঘ দিন ধরেই দুষ্প্রাপ্য। অথচ তাঁর রচিত প্রায় সব ক-টি গ্রন্থই প্রথম কলকাতায় ছাপা হয়েছে। আর এখন বাংলাদেশে ছাপা বইগুলিই আমাদের ভরসা। ঢাকা বাংলা একাডেমীর ছয় খণ্ডের রচনাবলির দীর্ঘকাল পরে কলকাতার করুণা প্রকাশনী হাবিব আর রহমান সম্পাদিত কাজী আবদুল ওদুদের *নির্বাচিত রচনা* প্রকাশ করে আমাদের আক্ষেপ খানিকটা মিটিয়েছিল। সম্প্রতি হাতে এল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাকে দুই বাংলার যৌথ উদ্যোগ হিসেবে দেখা যেতেই পারে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান বরেন্দু মণ্ডলের সম্পাদনায় ঢাকার কথাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত *কাজী আবদুল ওদুদ : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। আশা করা যায়, আমাদের ওদুদ-চর্চার বিস্মৃতি ঘোচাতে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট রসদ জোটাতে সক্ষম হবে। যে উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য সম্পাদক ভূমিকায় জানিয়েছেন :

> ধর্ম পরিচয়ে ওদুদ মুসলমান— একথা যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য ওদুদ বাঙালি। অথচ তাঁর ধর্মপরিচয়কে অন্যতম পরিচিতি হিসেবে দেখা বা দেখানো, অন্যদিকে অপরাপর পরিচয়কে আড়াল করে তাঁকে কেবলমাত্র 'মুসলিম ভাবুক ও চিন্তাবিদ' হিসেবে বিশেষিত করার অর্থই হল— বিগত শতাব্দীর অন্যতম মানবতাবাদী সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদী উদারনৈতিক ওদুদের পরিচয়কে খণ্ডিত করে দেখা।

খণ্ডিত করে দেখার এই ছকেই লুকিয়ে রয়েছে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও বাঙালি জাতিকে ঘিরে আত্মপরিচয় নির্মাণের দীর্ঘকালের দ্বন্দ্ব। তলিয়ে দেখলে আত্মানুসন্ধানের এই দ্বন্দ্বের সমাধানের দিশা খুঁজতে বাঙালির জোর চর্চা হতে পারে কাজী আবদুল ওদুদের লেখা এবং জীবনও। আলোচ্য গ্রন্থটি— *কাজী আব্দুল ওদুদ : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। ওদুদের সেই সামগ্রিকতাকে ধরার উদ্দেশ্য ছিল না। তবে যেটুকু আভাস কাউকে ওদুদ-চর্চার প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে তার সমস্ত রসদই রয়েছে।

ওদুদের জন্ম ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয়। মৃত্যু স্বাধীন ভারত আর 'পরাধীন' পূর্ব পাকিস্তানের এক অস্থির সময়ের মুখে। গোটা জীবন জুড়ে তাঁর অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষে জর্জরিত সমাজের রক্ষণশীলতা আর পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে লড়াই। উনিশ শতকে তথাকথিত রেনেসাঁ কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যশ্রেণির হিন্দু বাঙালির সম্মুখে আত্মানুসন্ধানের পথ খুলে দেয়। মুসলমান বাঙালি তখনও অপ্রস্তুত, দ্বিধান্বিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে আবদুল লতিফের 'মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি' (১৮৬৩) এবং মীর মশাররফ হোসেনের আত্মপ্রকাশ (১৮৬৯) থেকে। আরও পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের বিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (১৯২৬) এবং *শিখা* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন মুসলমান বাঙালির সমাজে যেন 'রেনেসাঁ'-র বিস্ফোরণ ঘটাল। অন্নদাশঙ্কর

রায়ের মতে, বাংলার দ্বিতীয় রেনেসাঁ বলা যায়, ওদুদই ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান প্রাণপুরুষ। *শিখা*-র মূল বাণী— 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব', নব্য গোঁড়া এবং উদারপন্থী ইসলামি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ছিল এক প্রবল কষাঘাত। ওদুদের পাশাপাশি এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আব্দুল কাদির প্রমুখও যুক্ত ছিলেন; এঁরা নিজেদের কামালপন্থী বলে পরিচয় দিতেই গর্ব বোধ করতেন। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন :

> এদেশের মুসলমানদের মধ্যে এর মতো আন্দোলন এর আগে কখনো হয়নি, ইসলামের ইতিহাসেও বোধহয় অভূতপূর্ব। এরা শাস্ত্রের অভ্রান্ত বচনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করতেন। উক্তির চেয়ে যুক্তিই এঁদের কাছে অধিকতর মূল্যবান। যে-কোনো সমাজে এটা একটা দুঃসাহসিক অভিযান।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে ওদুদের উদারমানবতাবাদী সংস্কার প্রচেষ্টা বাধা পেয়েছে ইসলামি রক্ষণশীলদের তৎকালীন দুর্গ ঢাকায়। বাধা সত্ত্বেও ওদুদ ছিলেন আপন বিশ্বাসে অটল। আসলে মুসলমান বাঙালির আত্মানুসন্ধান ও সত্তানুসন্ধান ছাড়িয়ে বিশ্বাত্মানুসন্ধানের প্রশ্নে ওদুদ ছিলেন কতকটা ইউরোপীয় রেনেসাঁর[৫] (শক্তিসাধন) আদর্শে অনুপ্রাণিত। তার সূত্রে বিনা দ্বিধায় আজীবন তিনি নিজ সম্প্রদায় ও পড়শি সম্প্রদায়ের সম্পর্ক-বিবাদ-মীমাংসা নিয়ে চিন্তা-আলোচনা করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আইএ (১৯১৩) পড়ার সময় কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপকুমার রায়, জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন রায়দের সহপাঠী। তখন থেকেই ওদুদকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন কাকাবাবু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও। ওদুদের মৃত্যুর পরে তিনি লিখেছিলেন, 'কাজী আবদুল ওদুদের সহিত আমার সাতান্ন বছরের পরিচয় ছিল।' সেই পরিচয়ের সূত্রেই তিনি দেখেছেন, কীভাবে সদ্য মফস্সলের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বেকার হোস্টেলে আশ্রয় নেওয়া ওদুদ থাকার সময় থেকেই 'সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ' নিয়ে জীবনে এগোতে শুরু করেন। এই যাত্রাপথে কাজী আবদুল ওদুদকে প্রভাবিত করেছেন অনেকেই। বিশেষ করে রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, গ্যেটে, রমাঁ রলা, তলস্তয়, এমার্সন, শেখ সাদির কথা উল্লেখ করতেই হয়। এবং অবশ্যই ওদুদ-মানসকে বলিষ্ঠতা দিয়েছেন হজরত মহম্মদ এবং কামাল আতাতুর্ক। স্বাভাবিক ভাবেই মানবাত্মার অপরিসীম বিকাশ সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন ওদুদ। সেই বিকাশ প্রায় চোদ্দোশো বছর আগে আরবের মাটিতেই চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে, ওদুদ তা মনে করতেন না। এই সব বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধেই বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিশ্বাস :

> তাঁর সে কাজ রামমোহনের কাজের সঙ্গেই তুলনীয়। মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজের মতো রেফরমেশন আবশ্যক। কিন্তু মুসলমানরা এতকাল এটা এড়িয়ে এসেছেন এই বলে যে তাঁদের ধর্ম সব ধর্মের শেষ কথা। তাঁদের নবী সব নবীর শেষ নবী। তাঁদের শাস্ত্র স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার বাণী। সুতরাং খ্রীষ্টিয় জগতে রেফরমেশন সম্ভব হতে পারে, হিন্দু জগতেও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ইসলামী জগতে অসম্ভব।

এই মনোভাবের বিরুদ্ধেই ওদুদের অবস্থান স্পষ্ট তাঁর *শাশ্বত বঙ্গ*-এর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে। আবার রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে তাঁর নিজাম বক্তৃতার (১৯৩৬) তিনটি প্রবন্ধেও একই ওদুদকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হত না। তাঁরা *নবপর্যায়* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে লিখিত 'সম্মোহিত মুসলমান'-এ কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন :

> প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম— স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে— কখনো পান ইসলামের স্বপ্ন, কখনো এই তেরো শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেষ্টন, যেন যাদু মন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তেরো শত বৎসর আগেকার 'শরীয়ত'-এর হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন। কত নিদারুণ তার জীবনের পক্ষে এই প্রভুর হুকুম তার প্রমাণ এইখানে যে, এর সামনে তার সমস্ত বুদ্ধি বিচার স্নেহ প্রেম শুভ ইচ্ছা, সমস্ত স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব, আশ্চর্যভাবে অন্তর্নিহিত হয়ে যায়, সে যে চিরদাস, চিরঅসহায়, অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ মানুষ, এই পরম বেদনাদায়ক সত্য ভিন্ন আর কিছুই তার ভিতরে দেখবার থাকে না।

ওদুদের এই যুক্তি সমকালে যেরূপ সত্য ছিল, প্রাসঙ্গিক ছিল তা বর্তমানেও। বিশেষ করে মুসলমান বাঙালির জীবনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে এমন নিপুণ আর ভয়ডরহীন ভাবে তুলে ধরেছেন খুব কম বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীই। সাধেই কি আর অন্নদাশঙ্কর রায় কাজী আবদুল ওদুদদের বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনকে বাংলার 'দ্বিতীয় জাগরণ' বলে চিহ্নিত করেছেন? কাজী আবদুল ওদুদ মুসলিম বাঙালিকে এই সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার পথই খুঁজেছেন সারাজীবন। মানুষের জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলায় ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে 'পাষাণ প্রতিমার সেবক পাণ্ডাদের মতো পাষাণচিত্ত' হয়ে 'মানুষের মাথায় কতকগুলো বিধি-নিষেধ ছুঁড়ে মেরেই আল্লাহ্‌র সৈনিক হওয়ার গৌরব'-এ মশগুল মুসলিম সমাজের কর্মকর্তাদের নিশানা করে গেছেন আজীবন (বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা)। তাঁর এই লড়াকু মনোভাবকে সম্মান জানিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। *নবপর্যায়* গ্রন্থ পড়ে ওদুদকে একটি চিঠি দিয়ে লিখেছিলেন :

> এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর এক সঙ্গে মিশেছে। গোঁড়ামির নিবিড় বিভীষিকার ভিতর দিয়ে কুঠার হাতে তুমি পথ কাটতে বেরিয়েছ, তুমি ধন্য।

তথাকথিত ঐতিহ্যপন্থী মুসলমান বাঙালি চিন্তাবিদরা ছিলেন শরীয়তমুখী। তাঁদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল ধর্ম, ইসলামের প্রতি ঘনিষ্ঠতা। মূল লক্ষ্য ছিল অতীত ঐতিহ্য নির্ভর রিভাইভাল। মওলানা আকরম খাঁ মুসলিম বাঙালি সমাজে এই চিন্তাস্রোতের কেন্দ্রীয় পুরুষ। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ লেখকের সাহিত্যের মাধ্যমে এ-ভাবধারা আরও পোক্ত হয়। যাঁদের মুখপত্র রূপে কাজ করে গেছে *মাসিক মোহাম্মদী*, *দৈনিক আজাদ* প্রভৃতি পত্রিকা। অপর দিকে এস ওয়াজেদ আলি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ্-এর মতো তথাকথিত উদারনৈতিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এঁদের বিপরীতে অবস্থান করছিলেন ঠিকই। চাইছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু তাঁদেরও চিন্তাচেতনার জগৎ ধর্মের বাইরে ছিল না। তাই এই উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা আত্মপরিচয় হিসেবে 'বাঙালি' আগে নাকি 'মুসলিম'— এই প্রশ্নে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ এক তৃতীয় অবস্থান থেকে এই দুই পক্ষকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দু-পক্ষের জীবন ও সমাজদৃষ্টিতে রক্ষণশীল ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থানকে যুক্তি ও মানববাদী মনোভাব দিয়ে মোকাবিলা করে গেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ নিজেও ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু নিজের স্বতন্ত্র অবস্থানও স্পষ্ট ভাবে বজায় রেখেছেন। ধর্মকে তিনি ধ্রুব সত্য বলে কোনোদিনই মেনে নেননি। বদলে তিনি পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষিতে ধর্মের এক সৃজনশীল ব্যাখ্যা নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় :

> ধর্মান্ধতা যেমন মানুষকে মারে, ধর্ম তেমনি মানুষকে বাঁচায়। যদি তা যথার্থই ধর্ম হয়ে থাকে। কাজী সাহেব ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।...ধর্ম নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন নয়। বরঞ্চ ধর্মকে তার সত্যরূপে অবলম্বন করেই জীবন।

আবদুর রাউফ জানিয়েছেন, শাস্ত্রবচনের অন্ধ অনুসরণের কাজী আবদুল ওদুদ বরাবর বিরুদ্ধতা করে গেছেন। কোনো ধর্মকেই নির্ভেজাল সত্য হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। উলটে সন্ধান করেছেন ধর্মের প্রকৃত সত্যরূপের। 'বাংলার জাগরণ' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের সতর্ক করে লিখেছেন :

> সব ধর্ম সত্য, এটি একটি শিথিল চিন্তা মাত্র। তার চাইতে সব ধর্মের ভিতরেই যথেষ্ট মিথ্যা বা অসার্থক ভাবনা রয়েছে, মানুষকে সেসব কাটিয়ে উঠতে হবে, এই চিন্তাই সত্যকার মর্যাদা। ধর্মের অপর নাম মনুষ্যত্ব সাধনা। আনুষ্ঠানিক ধর্ম যদি এই মনুষ্যত্ব সাধনের হয় তবেই তা ধর্ম, নইলে তা আচার অনুষ্ঠান মাত্র।

স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীর শাস্ত্রের অন্ধ আনুগত্যের গোড়ায় ঘা দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ বুদ্ধির মুক্তির পক্ষে সওয়াল করেছেন, যুক্তিবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষ নিয়েছেন। আর তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন এক সামগ্রিক মনুষ্যত্বের সাধনাকেও।

রামমোহনের যুক্তিবাদ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবাদ কাজী আবদুল ওদুদকে ধর্মের এই সত্যরূপকে সন্ধানে জোর জুগিয়েছে। সেই সন্ধানেই তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁর 'সৃষ্টিধর্মে'। এই সৃষ্টিধর্মের দৃষ্টি থেকেই ওদুদ খুঁজেছেন হজরত মহম্মদকে। করেছেন কোরানের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ বাংলা অনুবাদটি। এমন সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মবোধ থেকেই বোধ করি 'কোরআনের আল্লাহ্' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ লিখতে পেরেছেন :

> আল্লাহ্ বলতে আমরা বুঝেছি জীবনের এক অন্তহীন অগ্রগতির তাগিদ, সেই তাগিদে ও চলার পথের বিচিত্র সৌন্দর্যে আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুইই সচেতন ও আনন্দিত। ...সুবিজ্ঞ বিচারক যেমন বিচিত্র ও জটিলতম আইনের মধ্যে দেখেন জীবনের প্রয়োজন ও সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখে তার সুব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, কখনো কখনো করেন নতুন ক্ষেত্রে তার নতুন প্রয়োগ, আল্লাহ্র অভিমুখে যাত্রীও ধর্মের মর্মের সন্ধান পান ও জীবনের প্রয়োজনে নতুন নতুন ক্ষেত্রে তার নতুন নতুন প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে চলেন।

ঈশ্বরের ধারণাকে কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এগিয়ে চলার মধ্যে দিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক পরিবর্তনশীলতার ধারণা জুড়ে দিতে চাইছেন ওদুদ। ঈশ্বরের সঙ্গে এই সম্বন্ধে মানুষের স্বরূপ কেমন হবে? একই প্রবন্ধে তাঁর বিশ্বাস, 'কোরআনে মানুষকে বলা হয়েছে জগতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি... নিশ্চয় সেই মানুষের কথা বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ যে বহু সদগুণসমন্বিত শক্তিমান ব্যক্তি।' কাজী আবদুল ওদুদের স্বপ্ন ছিল— শাশ্বত এক বঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে বৈরিতা ভুলে জীবনের সর্বস্তরে গোঁড়ামি মুক্ত, ধর্মের সম্মোহন মুক্ত, সমাজ-ধর্ম-জীবন জিজ্ঞাসায় বস্তুনিষ্ঠ, মুক্তমনে জ্ঞান সাধনায় ব্রতী সর্বসংস্কার মুক্ত, আধুনিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, চিন্তা-চেতনায় উদার ও অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল মুসলিম বাঙালি সমাজ। বাস্তবে তার উলটো দেখে কষ্ট পেয়েছেন ওদুদ। কিন্তু কখনো নিরাশ হননি। তাই দেখি 'মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ লিখছেন :

> সত্যের আঘাত বড় প্রচণ্ড। মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতানুগতিকতাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে নব সৃষ্টি প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখিয়ে, মুসলমান সমাজের বুকে কামাল যে সত্যকার আঘাত দিয়েছেন, আশা করা যায়, এই আঘাতেই আমাদের শতাব্দীর মোহ নিদ্রার অবসান হবে। ধর্মে, কর্মে, জাতীয়তা, সাহিত্যে সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের ভিতরে স্থান পেয়েছে যে জড়তা, দৃষ্টিহীনতা, মনে আশা জাগছে, যেমন করেই হোক এইবার তার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে।

দেশভাগের পরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান বাঙালি জগতে যে নতুন এক মুক্তমনের সমাজ গড়ার কাজ শুরু হল, তাকে কাজী আবদুল ওদুদের বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের উত্তরাধিকার বললে অত্যুক্তি হয় না। এমনকী, আবদুর রাউফ লিখেছেন, যে-সব বুদ্ধিজীবীর ভাবনাচিন্তার অভিঘাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান

ঘটেছিল, তাঁদের অনেকেই ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদের ভাবশিষ্য। অথচ ইতিহাসের এমন একটি জরুরি চরিত্রকে আজ দুই বাংলার মুসলিম জগৎই ভুলতে বসেছে।

১৩৩৩ থেকে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ অবধি একচল্লিশ বছরের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদের মোট পঁচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে দুটি উপন্যাস, দুটি গল্প সংকলন, একটি নাটক, কোরানের দুই খণ্ডের অনুবাদ, হজরত মহম্মদের জীবনী এবং *ব্যবহারিক শব্দকোষ* নামে অভিধানটি বাদ দিলে বাকি সবই সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। এ ছাড়া ওদুদের কিছু পাঠ্যপুস্তক এবং একটি অপ্রকাশিত অসমাপ্ত আত্মকথাও রয়েছে। তবে তাঁর সব থেকে আলোচিত গ্রন্থ নিঃসন্দেহে *শাশ্বত বঙ্গ*, *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* এবং *কবিগুরু গ্যেটে*। কাজী আবদুল ওদুদ যে প্রবন্ধই লিখুন না কেন, তার পিছনে সব সময় আদর্শ ও লক্ষ্য কাজ করে গেছে। তাঁর চোখে সাহিত্য কেবলমাত্র ভাবসর্বস্ব, কল্পনা সর্বস্ব ও কলানৈপুণ্যের বাহন বলে মনে করেননি। তাঁর কথায়, 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের সমস্যার সমাধানের প্রয়াস। এই প্রয়াস জ্ঞাতসারেও হতে পারে, অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। সাহিত্য হচ্ছে সৌন্দর্যময় জ্ঞান।' সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এই সৌন্দর্যময় জ্ঞানের সাধনাকেই তিনি জীবনের ব্রত করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, মুসলিম বাঙালি সমাজের সংকট ও সম্ভাবনাই ছিল তাঁর সেই সাধনার প্রধান বিষয়বস্তু। আর সেখানে তিনি কতটা সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন, তা ওদুদের নিজাম বক্তৃতায় (যা পরে বিশ্বভারতী বই আকারে ছেপে প্রকাশ করেছিল) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যেই স্পষ্ট :

> এদেশে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন ক'রে আছে এমন এক-একটি সেতু। আব্দুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখন আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রচারশক্তির বিশিষ্টতা।

এই বিরোধের প্রধান কারণ কী? কাজী আবদুল ওদুদ দায়ী করেছেন হিন্দুত্ব এবং মুসলমানত্বকে। তাঁর মতে, অতীতে এবং বর্তমানে ঠিক যে চেহারা পেয়েছিল ও পেয়েছে, হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্বের তা-ই প্রকৃত রূপ— এই ভাবনাই আমাদের সমাজের সব থেকে বড়ো বিপদ। বরং এই দুই ধর্ম ভবিষ্যতে কীভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্মশক্তির সূতিকাগার হবে, দুই সম্প্রদায়ের সেই সাধনায় ব্রতী হওয়ার মধ্যেই এই বিরোধের মীমাংসা দেখেন তিনি। যে সাধনার মূল অনুপ্রেরণা হবে দুই ধর্মের অন্তর্নিহিত সেই সৃষ্টিধর্মই। নিজাম বক্তৃতার শেষ প্রবন্ধ এই 'ব্যর্থতার প্রতিকার'-এ কাজী আবদুল ওদুদ স্পষ্টই বলছেন :

> স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক। তার চাইতে এই কথা বলাই ভালো, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানব-মস্তিষ্ক, সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ যার ভিতরে হবে অবাধ। ইসলাম ও বেদান্ত মানুষের সৃষ্টি-শক্তিরই পরিচয়-চিহ্ন। মানুষের সেই সৃষ্টি-শক্তি কোনো দিন নিঃশেষিত হবে না, চিরদিন অক্লান্ত ও অম্লান থাকবে, এই-ই তার জন্ম-অধিকার। সে-অধিকার সত্য হোক।

বাংলার সমাজ-ইতিহাসে চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদের গুরুত্ব ঠিক কোথায়, তা আরও স্পষ্ট হয় তাঁর রেনেসাঁ নিয়ে আলোচনায়। এমনিতেই উনিশ শতকের বাংলায় যা ঘটেছিল, তাকে রেনেসাঁ বলা যায় কিনা, তা নিয়ে নানা তর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে দু-দল সহজেই চিহ্নিত করা যায়। একদল মনে করেন তা ছিল প্রকৃত অর্থেই রেনেসাঁ। অন্য দল তাকে 'অতিকথা' বলেই চিহ্নিত করতে রাজি। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন প্রথম দলের অন্যতম। রেনেসাঁ বিচারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না কাজী আবদুল ওদুদ। বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলনের সূত্রে হয়ে উঠেছিলেন খোদ রেনেসাঁর সক্রিয় কর্মীও। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'রেনেসাঁস বিচারক হিসাবে ওদুদের অবস্থানগত অন্যতর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, উনিশ শতকের তথাকথিত হিন্দু রেনেসাঁসের চরিত্র তিনি নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন মুসলিম জাগরণের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে। এটা একটা মনে রাখার মতো কথা।' কাজী আবদুল ওদুদ বাংলার জাগরণের তিনটি ধারাকে চিহ্নিত ('আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে) করেছেন— রামমোহনীয় ধারা (ব্রাহ্ম), হিন্দু কলেজীয় ধারা (ইয়ংবেঙ্গল) এবং নবহিন্দুত্বের ধারা (বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ)। এবং ইউরোপের ক্ষেত্রে যেমন গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথকে ওদুদ চিহ্নিত করেছেন 'উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট নবজাগরণের ঘনীভূত রূপ' হিসেবে। *Creative Bengal* (১৯৫০) গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, রামমোহনে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যে ধারা রচিত হয়েছিল, বঙ্কিমে এসে তা বাধাগ্রস্ত হয়ে একমুখী হয়। রেনেসাঁর আলোচনায় রামকৃষ্ণ-কেশবদের ধর্ম-আন্দোলনের নেতাদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের মতে :

> শিবনারায়ণ রায়ের রেনেসাঁস ভাবনার সঙ্গে ওদুদের এইখানে একটা বড়ো রকমের তফাত। অন্যান্য রেনেসাঁর ভাবুকদের মতো ওদুদও মনে করতেন রেনেসাঁসের প্রধান দিক তার জীবনমুখিতা ও সৃজনশীলতার দিক। এই মাপকাঠিটি তাঁর হাতে ছিল বলেই রামকৃষ্ণের সমন্বয়বাদী 'যত মত তত পথে'র প্রশংসা করেও তিনি বলতে পেরেছেন, 'মনুষ্যত্বের সাধনের দাবি তা তেমন মেটাতে পারেনি। তার উপরে প্রভুত্ব করেছে অতীত'। ... ওদুদের রেনেসাঁসের আলোচনার সবলতম দিক হচ্ছে বাংলার জাগরণের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমস্যাটিকে তিনি যে গুরুত্বে ও স্বচ্ছতায় আলোচনার আলোকে এনেছেন তা আর কেউ সেভাবে আনেননি।

রেনেসাঁর পক্ষে থাকা অধিকাংশ ভাবুকই হিন্দু সমাজের জাগরণের কথা বলেই আলোচনায় ইতি টেনেছেন। সেখানে কাজী আবদুল ওদুদ রেনেসাঁস আলোচনায় মুসলমান বাঙালি সমাজের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে স্থান দিয়েছেন। এবং রেনেসাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি মানবিক, যুক্তিবাদী ও সেকুলার সংস্কৃতি থেকে উলটো পথে হেঁটে দুই সম্প্রদায়ই কীভাবে জাতীয়তার সূত্রে রিভাইভালের স্বপ্নে সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, তা-ও নজর এড়িয়ে যায়নি ওদুদের। সন্ধান করেছেন মুক্তির পথ। তবু তরুণ বয়সে আহমেদ শরীফেরা কাজী আবদুল ওদুদের রেনেসাঁ আলোচনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনায় সামিল হয়েছিলেন। সেই সমালোচনা অনেকেরই মনে হয়েছে কিঞ্চিৎ একপেশে। বলা হয়, কাজী আবদুল ওদুদের রেনেসাঁ আলোচনায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবভিত্তিক উপাদান আলোচিত হয়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তা, ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যিক অবদানের প্রসঙ্গ তাঁর দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে বনেদি জমিদার বিলুপ্ত হলেও মধ্যস্বত্বভোগীদের বাড়তি পুঁজি জমিতে বিনিয়োগের ফলে নতুন জমিদারের সৃষ্টি হয়। এরা প্রজাহিতৈষী নয়, প্রজাপীড়নকারী। তিনি প্রসঙ্গটির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। এত কিছুর পরেও বাংলার রেনেসাঁর আলোচনায় কাজী আবদুল ওদুদকে বাদ দেওয়া সহজ নয়। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের কথায় :

> ... কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা তাঁর রেনেসাঁস ভাবনায় বিদ্যমান, কিন্তু তাতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার মূল্য কমে না। ...মনে রাখা ভাল মুসলিম সমাজে দাঁড়িয়ে আজ যে তাঁরা (আহমেদ শরীফ প্রভৃতি) দুচার কথা বলতে পারছেন, ওদুদই কিন্তু তার প্রথম সবল সূচনা-পুরুষ। রিভাইভ্যালিজমের প্রবল ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে ওদুদেরা 'শাশ্বতবঙ্গে'র স্বপ্ন ও আদর্শ রচনা করে গিয়েছিলেন...

এ সবের বাইরে ওদুদ-চর্চায় বাংলা গদ্যে, সাহিত্যচিন্তায় এবং অবশ্যই রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের স্থান কোথায়, এই বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নতুন সংকলিত এই শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের 'কবি ও কবিতা' এবং 'ভাষা ও সাহিত্য' অংশে পাঠক এমন কয়েকটি প্রবন্ধ এক জায়গায় পেতে পারেন, যার সূত্রে ওদুদের এই অনালোচিত দিকটি নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। কাজী আবদুল ওদুদের গদ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই প্রশংসা করে গিয়েছেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ওদুদকে লেখা চিঠিতে তিনি লেখেন, 'বাংলা ভাষায় আপনার যে রকম অধিকার, আর বাংলা সাহিত্যে আপনার যে রকম সূক্ষ্ম বিচারসঙ্গত অভিজ্ঞতা এমন অল্প লোকেরই দেখা যায়।' সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বাংলা গদ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরীও। *মোসলেম ভারত*-এ (১৩২৭) ওদুদের 'সাহিত্যিকের সাধনা' পড়ে *সবুজপত্র*-এ প্রমথ চৌধুরী লিখলেন :

> সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে মোসলেম ভারতে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্য সাধনার মহাগুণ এই যে, উক্ত প্রবন্ধে বিষয়টিকে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিচার করাও হয়েছে। এহেন সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙলা মাসিকপত্রে নিত্য চোখে পড়ে না। সাহিত্য যারা ভালবাসেন, এ লেখাটি তাদের পড়তে অনুরোধ করি। এ স্থলে আমি একথাটি বলা আবশ্যক মনে করি যে প্রবন্ধ লেখকের বেশির ভাগ মত আমি খাঁটি বলে মেনে নিই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে কাজী আবদুল ওদুদ ভেবেছেন মুসলিম বাঙালি লেখকদের নিয়ে। যাঁরা উর্দুকে মুসলিমদের এবং বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা বলে বিচার করেন, তারা তাঁর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বাংলা-উর্দু নিয়ে এই অংশের মানুষের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। 'উর্দু-বাংলা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> বাস্তবিক এই তথাকথিত ইসলাম ও মুসলিম-সংস্কৃতি-প্রেমিকদের ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা পর্বত প্রমাণ। ... পরম বিষয়ে আমি এদের আজ অনুরোধ করব কোরআন পড়তে ও একটু বুঝতে চেষ্টা করতে, আর তারপর বাংলার বাস্তবিকই যেসব মূল্যবান বই তাঁর কিছু কিছু পড়তে— অন্তত রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যখানি এরা পড়ুক আর তারপর ভেবে দেখুক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এরই মধ্যে উৎকৃষ্ট চিন্তায় কত বড় বাহন হয়েছে— কোরআনের অনুরূপ চিন্তাধারাও সে সাহিত্যে যতখানি রূপ পেয়েছে, উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ইসলামী সম্পদের সঙ্গে তুলনায় তার কী মর্যাদা।

এমন সাহসী এবং সোজাসাপটা কথা একমাত্র কাজী আবদুল ওদুদের মুখেই মনে হয় মানায়। অন্য দিকে, নিজের গানের বিশ্লেষণ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ১৯৩৪ সালে কাজী আবদুল ওদুদকে পাঠানো একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> আমার গান সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধ পূর্বেই পড়ে আমি বিশেষভাবে খুসি হয়েছিলুম। ... আমার বিস্তর গান আছে তা কাব্য, বাইরে থেকে সুর যোজনা না করলেও সুর আছে তার অন্তর্নিহিত। আমার নিজের বিশ্বাস কাব্য হিসাবে আমার অধিকাংশ কবিতার চেয়ে সেগুলি শ্রেষ্ঠ।...সমালোচকদের মধ্যে আপনিই প্রথম সাহিত্যে এই লিরিকগুলির যথার্থ স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

কাজী আবদুল ওদুদের এই দিকটি নিয়ে তেমন চর্চা না হওয়ায় আক্ষেপ ছিল অন্নদাশঙ্কর রায়েরও। বাংলার এমন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্রবিদকে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' না দেওয়াটা 'দেশের লোকেরই দুর্ভাগ্য' বলে নিজের তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছিলেন তিনি।

সমকালে এই জীবন দার্শনিক প্রায় বিস্মৃত হলেও ওদুদ-চর্চার ধারা বেশ দীর্ঘ এবং প্রাচীন। বাংলাদেশে ওদুদ-চর্চায় নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাম ওদুদেরই শিষ্য তথা শিখাকর্মী আবদুল কাদির। *কাজী আবদুল ওদুদ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬) গ্রন্থে তিনি

ওদুদের জীবনকথা ও সাহিত্য পরিচিতির সূত্র ও বিবরণ লিখেছেন, যা থেকে বিস্তৃত হয়েছে ওদুদ-সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা। এ ছাড়া সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত *ওদুদ-চর্চা* (একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮২ এবং পরে কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০১), খোন্দকার সিরাজুল হক *কাজী আবদুল ওদুদ জীবনীগ্রন্থ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), রশীদ আল ফারুকী-সম্পাদিত *কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ* (বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭), আবদুল হক-সম্পাদিত *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড* (১৯৮৮ ও ১৯৯০), নুরুল আমিন-সম্পাদিত *রচনাবলির তৃতীয় খণ্ড* (১৯৯২), খোন্দকার সিরাজুল হক-সম্পাদিত *রচনাবলির চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড* (যথাক্রমে ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫), হাবিব আর রহমানের সম্পাদিত কাজী আবদুল ওদুদের *নির্বাচিত রচনা* (করুণা, ২০১৭), মিহির মুসাকীর *কাজী আবদুল জীবনজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যাদর্শ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭) সারোয়ার জাহান সম্পাদিত *বঙ্কিম বিভূতি ওদুদ* (বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত *কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), নুরুল আমিনের *কাজী আবদুল ওদুদের রচনা ও বাঙালি মুসলমান সমাজ* (বাংলা একাডেমী, ২০০৮) তরুণ মুখোপাধ্যায়ের *কাজী আবদুল ওদুদ জীবনীগ্রন্থ* (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৫) এবং জাহিরুল হাসানের *কাজী আবদুল ওদুদ* জীবনীগ্রন্থের (নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৭) কথা উল্লেখ করা যায়। এর বাইরে নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ রায়, নুরুল আমিন, আবদুর রাউফ, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, আবুল ফজল, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বশীর আল্ হেলাল, ওয়াকিল আহমদ, আনিসুজ্জামান প্রমুখ কাজী আবদুল ওদুদ-কে নিয়ে নানা চর্চা করেছেন। এই সমস্ত চর্চায় ওদুদের বহু অনালোচিত দিক যেমন উঠে এসেছে, তেমনই আবার নানা সীমাবদ্ধতাও দেখা দিয়েছে। আবার এই তালিকা দেখে এটা স্পষ্টই, যে কাজী আবদুল ওদুদ বাংলাদেশের মনন জগতে যতটা স্থান পেয়েছেন, এই বাংলায় তার ছিটেফোঁটাটুকুও মেলেনি। অথচ সাতচল্লিশে দেশভাগের পরেও এই মাটি ছেড়ে যাননি সেকুলার, মুক্তমনা সমাজের ছবি দেখা ওদুদ। নানা সুযোগ এবং সম্মানজনক পদ লাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি আর কোনোদিন ঢাকায় ফেরেননি। পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী ফজলুর রহমান তাঁকে ঢাকায় আসার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। আসলে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হবে এমনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওদুদ নিজের সিদ্ধান্ত পালটাননি। ১৯৫১ সালে বাংলা সরকারের প্রাদেশিক টেকস্ট বুক কমিটির সম্পাদকের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরে বেগবাগানের কাছে ৮বি তারক দত্ত রোডে বাড়ি বানিয়ে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। আর সেই মানুষটিকেই আজকের বাংলা ভুলেছে। বাসা হাত বদল হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও তাঁর নামে রাস্তা বাস্তবায়িত করেনি কলকাতা পুরসভা।

এই অতল বিস্মৃতির মাঝে কলকাতার বই মহলে এই নয়া কাজী আবদুল ওদুদের *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* একপ্রকার স্বস্তিই দিল। যাঁর সূত্রে এই বিদগ্ধ ব্যক্তিকে আরও এক বার পড়ে দেখার সুযোগ হল। এই গ্রন্থের সংকলক বরেন্দু মণ্ডল নিজেও কাজী আবদুল ওদুদ চর্চার অভাব নিয়ে 'ভূমিকা'-য় আক্ষেপ জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক সুন্দরবন-চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ নাম বরেন্দু মণ্ডল। বাংলাদেশ এবং বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করছেন। এই গ্রন্থ যেন তাঁর সেই চর্চারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু। এই মুহূর্তে বাংলা বাজারে *শাশ্বত বঙ্গ* ও *বাংলার জাগরণ* ছাড়া কাজী আবদুল ওদুদ লিখিত আর কোনো গ্রন্থই তেমন প্রাপ্য নয়। বাংলাদেশের 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' থেকে যে অপর *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* রয়েছে তাতে বিচ্ছিন্ন ভাবে মাত্র বাইশটি লেখা সংকলিত হয়েছে। অন্য দিকে 'কথাপ্রকাশ'-এর এই গ্রন্থে সম্পাদক বেছে নিয়েছেন প্রায় দ্বিগুণ একচল্লিশটি প্রবন্ধ। যাকে তিনি সাজিয়েছেন পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক স্তরে। লেখাগুলিকে 'কবি ও কবিতা', 'নবজাগরণ, নৈতিকতা ও হিন্দু-মুসলমান', 'সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি', 'ভাষা ও সাহিত্য' এবং 'ব্যক্তি ও নেতৃত্ব' আকারে সাজানোর মধ্য দিয়ে সম্পাদকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কাজী আবদুল ওদুদের দেখা 'শাশ্বত বঙ্গ'-এর চেহারা নির্মাণ। সম্পাদক লিখেছেন, 'ওদুদ দেখিয়েছিলেন শাশ্বত বঙ্গের স্বপ্ন। ওদুদের প্রবন্ধের মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের সেই নীলনক্সাটাকে এখানে কেবল সাজিয়ে দেওয়া গেল আমাদের কালের পাঠকদের জন্য।' ওদুদের এতগুলি গ্রন্থের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধগুলিকে বাছাই করে বিষয় অনুসারে সাজানো কম পরিশ্রম ও মেধার কাজ নয়। এ ক্ষেত্রে সম্পাদকের বাহবা প্রাপ্য। তবে তাঁর সব থেকে বড়ো কৃতিত্ব তাঁর হাত ধরে অন্তত বহু যুগ ধরে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়া লেখাগুলি এ বাংলার সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছোল। তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছেন কাদের? 'শাশ্বত বঙ্গে যাঁরা মানবধর্মে বিশ্বাসী'। বাংলা বইয়ের অলংকরণে বর্তমানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম সব্যসাচী হাজরা এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। এই স্টাইলটি সব্যসাচীর প্রচ্ছদ ডিজাইনের একটি বিশেষ সিরিজের অংশ। এত কিছুর মধ্যেও কিছু অনুযোগ অবশ্যই থাকবে। এই সংকলনে মূল প্রবন্ধের তথ্য নির্দেশ হুবহু ছাপা হয়েছে। এটি ওদুদেরই তৈরি করা তথ্য নির্দেশ নাকি বর্তমান সম্পাদকের, নতুন পাঠকের কাছে তা ধন্দ তৈরি করতে পারে। পুরোনো তথ্য নির্দেশ রেখে দেওয়ার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক নতুন কিছু তথ্য (যেমন প্রবন্ধটি প্রথম কোন গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল) সংযোজিত হলে বইটির ধার ও ভার, দুই-ই বাড়ত। সেই সঙ্গে 'গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ', 'জয়তু মাহাত্মা' বা 'রামমোহন ও মুসলিম-ধারণা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলিও এই সংকলনে স্থান পাওয়াটা জরুরি ছিল বলে মনে হয়। তবু, এই যতটুকু হয়েছে, তাঁর জন্য সম্পাদকের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য। আজ সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর অসম্প্রীতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলার মাটিতেও ধর্মীয় মৌলবাদীদের আস্ফালন

তীব্র হচ্ছে। এই সংকটের সময়ে কাজী আবদুল ওদুদের লেখাগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে কাজী আবদুল ওদুদের রচনার এই সংকলন প্রকাশিত হওয়াটা ভীষণই জরুরি ছিল। কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায়ের মূল্যায়ন ছিল—

> কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যান-ধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারল।

এমন লিবারল মানুষদেরই যে এখন সব থেকে বেশি করে দরকার।

গ্রন্থঋণ

১. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'জীবন দার্শনিক ওদুদ', *দেশ*, ৩৭শ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, ১২ আষাঢ় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
২. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী আবদুল ওদুদ', *দেশ*, ৩৭শ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, ১২ আষাঢ় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৩. আবদুর রাউফ, 'যাঁর মন্ত্র ছিল বুদ্ধির মুক্তি', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ আগস্ট ১৯৯৩ সাল
৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'প্রবল ঝড়ের মুখেও দিশা হারাননি তিনি', *আনন্দবাজার পত্রিকা* ৮ আগস্ট ১৯৯৩ সাল
৫. সাইফুল আলম, 'বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব : কাজী আবদুল ওদুদের ভাবনা', *কালি ও কলম*
৬. সাঈদ-উর রহমান (সম্পাদিত), *ওদুদ-চর্চা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০১
৭. গৌতম রায়, কবির রায়হান, নূর কামরুন নাহার এবং মিলন দত্তের নানা লেখাপত্র